নতুন গ্রামের পাঁচালি

অজয় কোনার

বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। আর নীরদ সি তো পুরো একটা কেতাব লিখেছেন, যার নাম 'আত্মঘাতী বাঙালী।' নাক উঁচু, নিজের কিছু হয়ে ওঠার চেষ্টা নেই, অথচ পরশ্রীকাতর, কূপমন্ডুকতায় আক্রান্ত অথচ প্রতিভাবান, এমন জাতটি 'কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।' এটা 'ধান ভানতে শিবের গীত' নয়। নতুনগ্রামে এসে এই কথাটাই মনে হচ্ছিল বারে বারে। নিজেদের সংস্কার আর ঐতিহ্যের উপর শ্রদ্ধা নেই, অথচ অনুকরণ প্রয়াসী এমন জাত খুব বেশি পাওয়া যাবে কি!

নতুনগ্রামের নতুন করে পরিচয় ফেঁদে বসার বোধহয় প্রয়োজন নেই। একটা সময়ে মা-ঠাকুরমা-দিদিমায়েরা গঙ্গাস্নানে গেলে কিম্বা কোনো মেলায় গেলে বাড়ির কুচোকাঁচাদের জন্য নতুনগ্রামের পুতুল গৌড়-নিতাই, বংশীধারী কৃষ্ণ, রাজারানি কিম্বা প্যাঁচা অবশ্যই নিয়ে আসতেন চিনির মঠ, কদমা, নকুলদানা আনার সঙ্গে।

নতুনগ্রাম কোথায়, কীভাবে যেতে হয়, সে বৃত্তান্ত অনেক মহাজন লিখে গেছেন, ভবিষ্যতেও হয়তো লিখবেন আরও কেউ, তাই ভূগোলবৃত্তান্ত বাদ দিয়েই চলুক এখন। নামের নামাবলীও অনাবশ্যক। এইসব খেজুড়ে কথায় কস্য লাভ! বরং চলুক সেখানে কারা বাস করে আর কী করে, সেই পাঁচালি। সেও অবশ্য অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো হবে, তা আগেই গেয়ে নেওয়া নিরাপদ।

এই গ্রামের সূত্রধরেরা যাত্রাগানে সূত্র না ধরলেও ছুতোরের কাজ করতেন। কাজ তো কম ছিল না। মাটির বাড়ির খড় কিম্বা করোগেটে-সিটের ছাউনির বাড়িতে ছাউনির খাঁচা তৈরি, সরদলের কাজ, শৌখিনতা দেখাতে তাতে কারুকাজের বাহার আনা, দরজা-জানালা তৈরি। তার সঙ্গে গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি, এসবও ছিল। তা গাঁ-ঘরে রোজ তো আর বাড়ি তৈরি হয় না, আর একটা গাড়ির চাকা ছ-সাতটা চাষ হেসে-খেলেই চলে যায়। তা ছুতোরের সংসার তো চলতে হবে। 'ফাঁকা টাইমে' তাই ছুতোর তৈরি করত কাঠের নানা খেলনা, শিমুল, শ্যাওড়া, ছাতিম, জিওল, আমড়া,— এইসব 'আকাঠা' দিয়ে। ছুতোর তো মূর্তি খোদাই করেই খালাস, সেইসব মূর্তিতে রঙ ধরাত ছুতোর গিন্নি। বর্ধমান জেলার এই উত্তর দিকটায় চৈত্র মাসে শিবের গাজনে বোলান গানের বোলবোলাও খুব। ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত তাই বলে কেউ গায় না। ছুতোর বাড়ির বৌ-ঝিদের নিজের সংসারের কাজ সামলে গাঁয়ের আর পাঁচটা বাড়িতে ধান-ভানা, চিড়ে-কোটা, এসব করেও কিছু সুরাহা করতে হত সংসারের। কিন্তু সে কাজও রোজ থাকত না। সেও অবসরের সময়ে গুঁড়ো করা তেঁতুল বিচির আঠাতে রঙ মিশিয়ে পুতুল রঙ করত, চোখ-মুখ আঁকত। তারপর বেশ কিছু মূর্তি তৈরি হলে পাইকারের কাছে তা বিক্রি করে দিত শ' হিসাবে। অবসর সময়ের এই কাজই একটা সময়ে পুরো সময়ের কাজ হয়ে দাঁড়াল। কারণ বাড়ি হয় এখন কংক্রিটের, দরজা-জানালায় কাঠের বদলে স্টিলের আর ফাইবারের ব্যবহার। কাঠ এখন বড়ো দামি। গরুর গাড়ির চাকাও এখন স্টিলের, তার উপর ট্র্যাক্টর এসে গেছে। সুতরাং ছুতোরের কাজ গেছে। এখন তাই এই পুতুল তৈরি করাই একমাত্র জীবিকা এই পরিবারগুলোর।

তা এই পুতুলের কাজ করেই গ্রামের শম্ভু সূত্রধরের বরাতে রাষ্ট্রপতির পদক জুটে গেল। সে তখন থেকে নিজের পদবি পাল্টে 'ভাস্কর' বলত। তার দেখাদেখি গ্রামের অন্যরাও এখন নিজেদের 'ভাস্কর' বলে থাকেন। তা বলতেই পারেন। ভাস্কর্যের কাজই তো এনারা করে চলেছেন। এঁরা কী সেসব বাবুভেয়েদের মত নাকি, যারা নিজেদের বিষয়টাও ঠিকমত জানেনা অথচ 'ডাক্তারা' উপাধি লেখে নামের আগে! কেউ তো আবার সেই উপাধিটাও নাকি চক্ষুদান করে পেয়েছেন বলে লোকে বলে। তা এমন সব মহাশয়দের পবিত্রবাণী তো অনেক শোনা হয়েছে এককালে, এখন এই ভাস্করদের কথাই বরং হোক, নাকি!

এখন তো গ্রামের মেলাতেও শুধু জুয়োর আসর, আর দোকান-পাট বলতে সব সস্তার চিনে খেলনার। মেলাগুলোও তো এখন ফড়েদের হাতে চলে গেছে। নতুনগ্রামের পুতুল নিয়ে যে লোকটা বসবে, তার অত পুঁজি কোথায়! তা ছাড়া এসব পুতুল আর কেনেও না কেউ। সেকেলে ঠাকুরমা-দিদিমায়েদের কাল চলে গেছে। শহরের 'আন্টিরা' এসব গেঁয়োপনা সহ্য করতে পারেন না। আর কেউ যদিবা 'লোকসংস্কৃতি' রক্ষার তাগিদে এসব কিনে কোনো বাচ্চাকে উপহার দেন, তার নাগরিক মায়ের মুখ ভার হয়। আজকাল ফ্ল্যাটে থাকা মানুষের কোনো কিছু ফেলে দেওয়াটাও যে সমস্যা!

কিন্তু নতুনগ্রামের এদেরও তো বাঁচতে হবে! এরা এখন এইসব খেলনার সঙ্গে তৈরি করছে বাহারি ল্যাম্প স্ট্যান্ড, বসবার ছোটো-টুল, চায়ের-টেবিল, যার স্ট্যান্ড ওদের নিজেদের শৈলীর প্যাঁচা। সে সব অনেকেই পছন্দ করছেন, বেশ একটা 'এথনিক টাচ' আছে! সহজেই নিজেকে 'লোকসংস্কৃতির'র ধারক বলে আত্মশ্লাঘা পাওয়ার উপায়!

মহাজনেরা বলে গেছেন উপর দিকে থুতু ছিটোতে নেই, নিজের মুখেই এসে পড়ে। থাক তাই। বাঙালি হয়ে বাঙালিকে গাল দেওয়ার মধ্যে একটা 'ইনটেলেকচুয়াল টাচ' থাকলেও কোনো চর্তুভুজ হবার যখন উপায় নেই, তখন সেই 'বন্ধ্যাগমন প্রয়াস' ছেড়ে এই ভাস্করদের কথায় ফেরা যাক। কোনো মহাজনেরা বলেছেন খালি পেটে শিল্প হয় না। যত ছেঁদো কথা। সেইসব মহাজনেরা কি প্রত্যন্ত গ্রামের এইসব মানুষদের দেখেছেন বা সঙ্গ করেছেন, যাদের কেউ গান করেন, কেউ বাঁশি বাজান, কেউ মূর্তি তৈরি করেন, অথচ সংসার যাদের খিদেয় সবসময় হাঁ করে আছে? সেমিনার হলে কিম্বা বন্ধুর বাড়ির ড্রইংরুমে বসে কথা বলা এক, আর খেটে খাওয়া এই মানুষগুলোর সঙ্গ করা আর এক। এক বিখ্যাত মহাজন আন্তন চেকভের কথা এসেই যায়। ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পরে লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এক বন্ধু একদিন বললেন— ভাই, অত ভালো গল্পের হাত তোমার, অথচ তুমি লেখা ছেড়ে দিলে! চেকভের নিস্পৃহ উত্তর— তখন খাবার জুটত না, তাই লিখতাম। এখন ডাক্তার হিসাবে একটু পশার হয়েছে, লিখে সময় নষ্ট করবে কেন!

সেবার নতুনগ্রামে গিয়ে এক চমক। এক ভাস্করকে দেখা গেল একমনে একটা একচালা দুর্গামূর্তি বানাচ্ছেন। উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট তো বটেই। কোনো পুজো কমিটি নাকি এবার বরাত দিয়েছে। এত বড়ো একটা মূর্তি বানানো, তাও আবার কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী আলাদা নয়, অসুরদলনী, সিংহবাহনা মায়ের সঙ্গে একই চালে! বড়ো পরিশ্রম আর ধৈর্যের কাজ। সাহায্যের জন্য ভাস্করের দুই ব্যাটা বাপের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কোনখানে কতটা কাঠ জুড়তে হবে, বাপের বাটালির রেখা দেখে কোথায় কতটা খোদাই করতে হবে, সেই কাজ করে চলেছে। বাপ তো তাও দাঁতে বিড়ি চেপে ধরে লোকের সঙ্গে গল্প করা, বৌ আর মেয়েকে তাড়া দেওয়া চালিয়ে যাচ্ছে নিজের হাতের বাটালি না থামিয়েই। নিজের ঝি-বৌকে তাড়া না দিয়ে উপায় কি, পাইকের এসে ফিরে গেলে মুসকিল। ক'দিন মাঝে বৃষ্টি হয়ে রঙের কাজ বন্ধ ছিল। শ' দুই প্যাঁচা আর রাজা-রানি রঙ করা বাকি। পুজোর সময় তাও এসবের একটু বিক্রি-বাটা হয়। শহরের পুজোগুলোতে পাঠাতে পারলে অনেক বেশি বিক্রি হত, কিন্তু সেইসব পুজো কমিটির খাঁই খুব বেশি। বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো কেন, তাকানোর চেষ্টা করেও লাভ নেই। ছোটো মাপের মানুষের আশাগুলোও ছোটো ছোটো। ভাস্করের বড়ো ছেলে মাধ্যমিক পাশ করেছে তিন বছর আগে। আর পড়াশোনা না করে বাপের কাজেই লেগে গেছে। ছোটোটা আট ক্লাশে পড়ে। ইসকুলে নাম লেখানো আছে, কিন্তু যায় কিনা, কে জানে! এখন তো বাপের সঙ্গে কাজ করছে, অথচ ইসকুল তো আজ ছুটি নয়! বড়ো আনন্দ হল। ভাগ্যিস থিম পুজো বলে কী একটা যেন শুরু হয়েছে। এই জন্য অন্তত বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের পটুয়ারা যেমন কিছু কাজ পাচ্ছে, তেমনই গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকশিল্পের শিল্পীরা। জয় হোক লোকসংস্কৃতি চর্চার! আমরা যে মরে গিয়েছি, সেটা এখনও আমরা বুঝে উঠিনি, কিন্তু এই নতুনগ্রামের ভাস্কররা এখনও দারুণভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে!